মুখোমুখি বসিবারে সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী

● অদিতি ফাল্গুনী

রমা চলে গেছে আজ দুই মাসের মত। শেষের কয়েকটা বছর যে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে তা' বলার নয়। না, দাহ হয়নি তাঁর। রমা মুখে খুব বড় কথা বলার মানুষ ছিল না কোনদিনই। সাধারণ গৃহবধূরই জীবন পার করেছে আপাত:দৃষ্টে। তবে স্বামী বা বড় ছেলের বিজ্ঞান চর্চা বা নাস্তিক্য আন্দোলনে বাঁধাও দেয় নি। শোবার ঘরের এক কোণে দেব-দেবীর ছবি রেখে সকাল-সন্ধ্যা ফুল কি ধূপ-ধুনো দিত আবার খাবার টেবিলে স্বামী-পুত্রের পদার্থবিদ্যা বা মহাকাশ বিদ্যার আলাপও শুনেছে। সুজেয় চৌধুরী নিজে যেদিন মৃত্যুর পরে দেহ দাহ করার বদলে মেডিকেলের মর্গে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্গ সংস্থান শেখার কাজে দান করবেন বলে যাবেন, রমাও হুট করে ঘরে পরার কাপড় বদলে এলেন।

'তুমি কোথায় যাবে?'

'তোমার সাথে'

'ওহ আমাকে বুঝি আটকাতে চাও?'

সুজেয় চৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন।

'উঁহু আমিও মরণোত্তর দেহ দান করতে চাই।'

'বলো কি তুমি?'

'ওপ্পে আমি হয়ত তোমাদের মত পন্ডিত নই- বিজ্ঞানী নই। মূর্খ হাউজ ওয়াইফ। কিন্তু কোনটা বড় ধর্ম সে কি আমি বুঝি না? আমি মরে গেলে দামি কাঠ কিনে, ঘি ছিটিয়ে পোড়ানোর পর এক মুঠ ছাই হবার থেকে গরীব দেশে মেডিকেল ছাত্রদের পড়ার কাজে আমার মরা শরীরটা কাজে লাগলে সেই ত' বড় পূণ্যের কাজ হবে, ধর্মের কাজ হবে।'

'ক্রোশ ক্রোশ পথ সফর করতে গিয়ে কখনো কখনো কোন সরাইখানায় বা রাজ দরবারে কোন নর্তকীর কাছে যাই নি তা' বলব না। যৌবনে পুরুষের কেমন হায়েনার মত ক্ষুধা থাকে তুমি ত' জানো। তবে, সে ক্ষুধাও যে আমার মাথার উপর চড়ে আমার মালিক হয়েছে তা' নয়। জীবন আমার কিতাব আর কম্পাসের সাথে, চুম্বকের সাথেই কেটেছে বেশি।'

মোবাইলে রিং বাজছে।

'হ্যাল্লো সুজেয় স্যার বলছেন? আমি দৈনিক সচিত্র সময় পত্রিকার ক্রাইম বিট থেকে বলছি স্টাফ রিপোর্টার হান্নান মাহবুব!'

'বলুন?'

'স্যার- শুভ্রজিত হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার কাছে কি কোন আপডেট আছে? আপনার স্ত্রী মারা গেলেন- ঘুরে-ফিরে আবার বইমেলার মাস এলো। এই ফেব্রুয়ারিতেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। চার বছরে তদন্তের অগ্রগতি কতটুকু হলো? সব মিলিয়ে আপনার অনুভূতি কেমন?'

'সামনে ত' চার্জশীট দেবে বলছে!'

'দিলে কত তারিখ নাগাদ দিতে পারে?'

'এখনো ঠিক হয়নি। অনুমোদনের জন্য চার্জশীট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।'

'ওকে স্যার- থ্যাঙ্ক ইউ। চার বছর লেগে যাবে একটি চার্জশীটের জন্য?'

'হ্যাঁ- মামলার তদন্ত ত' শামুক গতিতে চলছে। কি আর করা! আমাদের কলোনীয়াল আইন-আদালত আর বিচার ব্যবস্থা!'

'স্যার- আপনাকে কি রিপোর্টে কোট করতে পারি?'

'হ্যাঁ- নিশ্চয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!'

'হ্যাঁ- আপনাকেও ধন্যবাদ।'

ফোনটি খাবার টেবিলে রেখে নিজেই শ্লথ পায়ে রান্নাঘরের দিকে যান। পাশের ঘরে ছোট ছেলে, ছোট ছেলের বউ আর দুই যমজ শিশু কন্যা হাসছে আর কথা বলছে নিজেদের ভেতর। ছোট পুত্রবধূর মা কিছুদিন হয় এসে থেকে গেছে। একটি কিশোরী মেয়ে ছোট বউ মা'কে রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করে। রমাকে শেষের দু/তিন বছর যে বুয়া দেখতো, তাকে নিজে থেকে চলে যেতে বলতে বাঁধছিল সুজেয় চৌধুরীর। তবে, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। রমার মৃত্যুর দিন দশেক পরে এক সকালে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে এসে বললো, 'খালু একবার কদমবুচি করতে দ্যান।'

'কই যাচ্ছ তুমি? আরে আমি কি তোমাকে যেতে বলেছি নাকি?'

'এখানে অষন ত' আমার তেমন কিছু করার নাই। আর সবখানেই খালাম্মার স্মৃতি। মনটা বড় পোড়ে।'

'যাবে কোথায় এখন?'

'দ্যাশে যাব। মাইয়া দুইটা বড় হইতাছে। আমার আম্মা- অদের নানী বুড়া হইয়া যাইতেছে। তার আর অত তাকদ নাই নাতনীগো দেখার।'

'তোমার বর?'

'সে ব্যাটা আর এক জায়গায় নিকা বইছে ত' ম্যালা দিন আগেই!'

'ওহো-'

'আসি- খালু- দোয়া রাইখেন।'

'দাঁড়াও যাবার আগে তোমার সব পাওনা বুঝে নাও। আর গত দু/তিন বছর তুমি যা করেছো- এ বাড়িতে তোমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে-'

কথাগুলো বলতে গলা ধরে এসেছিল তাঁর। আজ ছুটির দিন। ছোট ছেলে আর ছোট বউ মা দু'জনেই স্কুল শিক্ষক। সারা সপ্তাহ কাজের পর শুক্রবারই ওরা খানিকটা ঘরে একসাথে সময় কাটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মত বাজে। এখন এক কাপ চায়ের জন্য ওদের বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। মিনি নামের কিশোরী গৃহকর্মীটি ড্রয়িং রুমের কার্পেটে বসে একটু পড়ছে। পড়ুক। রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে তিনি নিজেই এক কাপ চা করে নিলেন। এখন রমার রেখে যাওয়া ফাঁকা ঘরের পাশে চিলতে ব্যালকনিতে বসে তিনি এক আকাশ তারা ঠিকই গুনতে পারবেন। আর এই তারা দেখতে দেখতেই তাঁর সামনে অস্পষ্ট ছায়ার আকারে চলে আসবে শুভ্র শ্মশ্রু আর দীর্ঘ জোব্বা বা আলখাল্লা পরা সেই মধ্যযুগীয় পন্ডিত।

নব্বইয়ের দশকে ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের খাওয়ারাজম নামে এলাকায় যাঁর জন্ম হয়েছিল। যার একপাশে উত্তর তুর্কমেনিস্থান আর এক দিকে পশ্চিম উজবেকিস্থান।

'কি হে ছোকরা? কেমন আছ?'

'আমাকে ছোকরা বলছেন? জানেন আমার বয়স কত?'

'যত বয়স হোক, আমার চেয়ে বয়স ত' তোমার কিছুতেই বেশি নয়। বলো ত' আমার বয়স ঠিক কত?'

'কত যেন?'

সুজেয় চৌধুরী বিব্রত হয়ে মাথা চুলকান।

'৯৭৩ সালে তোমরা যাকে খ্রিষ্টাব্দ বলো আমার জন্ম। মারা গেছি সাতান্তর পার করে। এখন আমার বয়স কত হবে তাহলে?'

'কি করে বলি- আমার কাছে ত' এখন ক্যালকুলেটর নেই!'

'হুম্ম তা' একটা জীবন এই একটা শহরেই বলতে গেলে কাটিয়ে দিলে? জওয়ান কালে সেই অল্প কিছুদিন বিলিতি সাহেব মুলুকের কোন্ এক লীডস শহরে কয়েক বছর আর তারপর বাকি জীবনটা এই এক দেশ আর এক শহরে?'

'হুম্ম মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুদিন আসামে ছিলাম!'

'ঐ হলো- হিন্দুস্থান ত' সেদিন তিন টুকরা হল- তার আগে ত' একটাই দেশ ছিল। তাহলে? একটা জীবন একটা কি দু'টো শহর আর দেশেই শেষ করলে? এজন্যই তোমার কিছু হল না- বুঝলে?'

'আপনি ত' অনেক ঘুরেছেন।'

'ক্রোশ ক্রোশ পথ সফর করতে গিয়ে কখনো কখনো কোন সরাইখানায় বা রাজ দরবারে কোন নর্তকীর কাছে যাই নি তা' বলব না। যৌবনে পুরুষের কেমন হায়েনার মত ক্ষুধা থাকে তুমি ত' জানো। তবে, সে ক্ষুধাও যে আমার মাথার উপর চড়ে আমার মালিক হয়েছে তা' নয়। জীবন আমার কিতাব আর কম্পাসের সাথে, চুম্বকের সাথেই কেটেছে বেশি।'

'আলবত- ঘুরেছি বলেই ত' এত কিছু দেখেছি। কত কি জেনেছি! আমাদের সময়ে বাপু তোমাদের মত উড়োজাহাজ ছিল না। সেই উটের পিঠে চড়ে, কখনো গাধা-খচ্চর-ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবার কখনো হাতির পিঠে চড়েওকখনো পালকি কি ক্রোশ ক্রোশ পথ হেঁটে এক দেশ থেকে এক দেশে যেতাম আমরা! গনগনে মরুর বালুতে হিসাব মাপা পানি কাফেলার সবাই খাচ্ছে। কতজন উদরাময় হয়ে মারা যেত! ঘরে বসে সুখের জীবন পার করলে কি চলে? কত বড় বিজ্ঞানী হবার কথা ছিল তোমার- খোদা মাথায় কিছু মাল-মশলাও দিয়েছিলেন। আর কি হলে?'

'আসলে দেশে সেই উনসত্তর সালে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার। শেখ সাহেব তখনো বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি। তবু মানুষের হৃদয়ের নেতা হবার পথে। স্বাধীন দেশ হবে- এমন একটা অব্যক্ত আকাঙ্খা আমাদের অনেকের মাথায় ঘুরছে। এছাড়া বিয়ে করেই নতুন বউকে রেখে গেছি। পিএইচডিটা হলো। দেশে ঢাকা ভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের চাকরি। একজন বাঙালী যুবক আর কি চাইতে পারে?'

'নিশ্চয়তা- আহ- নিশ্চয়তা- এর থেকে খারাপ কিছু আর হতে পারে না! আমাকে দ্যাখো- জন্ম হয়েছিল মধ্য এশিয়ার খোরাসমিয়ার কাছে। জীবনের প্রথম বছর পঁচিশ কাটিয়েছি জন্ম শহরেই। আফ্রিদি বংশে। তখনো তুর্কী ভাষা, আচার-আচরণ আমার জন্মভূমিকে গ্রাস করেনি। তখনো আমরা আমাদের মাতৃভাষা খাওয়ারেজমে কথা বলতাম। ৯৯৫ সালে বিদেশী তুর্কীরা আমাদের শহর দখল করলে পালালাম বুখারায়। সেখানে তখন সামানিদ শাসক নুয়ের ছেলে দ্বিতীয় মনসুর বাদশাহ। সেখানেই ইবনে সিনার সাথে যোগাযোগ হল আমার।'

'তবেই দ্যাখেন। বিদেশীরা শহরে হামলা করলো বলেই না পালালেন! জন্মভূমি ছাড়লেন। আমাকেও যেমন ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চ মাসে। এমনি এমনি কি কেউ দেশ ছাড়ে? সেই যে মহাভারত-এ বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির বলছেন যে সুখী সেই মানুষ যে দিনের শেষে স্বদেশে বসে নিজ কুঁড়েঘরে শাকান্ন গ্রহণ করেন-'

'আরে- তুমি আমার কথা ত' শুনবে, নওজোয়ান? সব কথা ত' নিজেই বলে চলেছো!'

'জ্বি- জ্বি বলুন!'

'বুখারা থেকে আমি গেলাম তাবারিস্থান। সেখানে বসেই লিখলাম আমার প্রথম বই। তারপর গেলাম বাভান্দিদের বাদশা আল-মারজুবানের সাথে দেখা করতে। গজনীতে বাদশা মাহমুদ ক্ষমতায় এলেন। আমাকে তাঁর দরবারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী করলেন। ভারত অভিযানের সময় আমাকে সাথে নিলেন। হিন্দুস্থান গিয়ে সংস্কৃত শিখেছি, পতঞ্জলির লেখা তর্জমাও করেছি।'

'একটা কথা বলবেন? সেই যুগে বসে কি করে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ বা পরিধির অমন নিখুঁত জ্যামিতিক ছবি এঁকেছেন? চাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র?'

'সফর- সফর- জীবন এক আশ্চর্য ভ্রমণ। ভ্রমণেই সব শিখবে তুমি। ঘর থেকে যখন প্রথম বের হলাম- নয়া নয়া মুলুকে যাই আর ঝামেলায় পড়ে যাই যে নামাজের কিবলা কোন্ দিকে হবে? সূর্য আর চাঁদের ঠিকঠাক হিসাব ছাড়া ত' এসব হয় না। সেসব হিসাব ঠিক করতে গিয়েই দিন দিন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে আরো জড়িয়ে গেলাম। এবার বলো ত' তুমি কেন আমার বিষয়ে এত আগ্রহী?'

'আসলে লীডসে কাজ করার সময় সাদা বিজ্ঞানীরা মুখে কিছু না বললেও ওদের হাব-ভাবে মনে হত আমরা পূর্বের মানুষ কিছুই পারি না। তখন একদিন একটা বইয়ে আপনার কাজ আজো বিজ্ঞানে কত প্রাসঙ্গিক জানতে পারি। সেই থেকে কৌতূহল। আচ্ছা- সেই যুগেই কিভাবে মনে হয়েছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে?' (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)

শি ক দা র মু হা ম্ম দ কি ব্রি য়া হ

এই শুদ্ধ মধুবনে

ভাবির টিপ্পনি যেন বেঁকে আসা বৃষ্টির চিমটি
উন্মত্ত বাতাসে কাঁপা বৈশাখের তুমুল বাদল,
দেখি উঠোন ঢেকে পড়া শুভ্র অনিন্দ্য রূপটি
জ্যোৎস্নার টুকরো হয়ে ঝরে বৃষ্টির ছোবল।

আপার কোঁচড়ে গুটিগুটি আম উষ্ণতা গিলেছে
বৃষ্টির জলে ভিজেছে কম্পমান কবুতর দু'টি,
নম্র মাংশের ভূগোল জলছাপে অস্তিত্ব মেলেছে
যেন বেআব্রু বৃষ্টিতে মুখ তোলে উদ্ভিন্ন সে জুটি।

সূর্যের বেগুনি রশ্মি চেটে নেয়া নাজুক শরীর
নরম কাদার ক্ষীরে ভরে তোলে ত্বকের ফাটল,
তামাটে শরীর তাই সোদাগন্ধী মাটির নজির
বৃষ্টির আদরে খোলে বঙ্গদেশ মৃত্তির আগল।

এই দেশ এই মাটি আটপৌরে বৃষ্টির জীবন,
এখানেই র'বো আমি চিরকাল শুদ্ধ মধুবন।

হা সা ন স্ব জ ন

লোভ-হিংসা-অহংকার

লোভাতুর আঁখি আর লোভে পড়া মন
জয় হলে সাময়িকী নয় বেশিক্ষণ।
লোভের মোহে পড়ে গড়েছো যে যাই
হিসাবের খাতা কষে দেখো সুখ নাই।
লোভ হোক টাকা কি বা নারী আর কিছু
যাঁতাকলে মাথা যায় মন হয় নিচু।
ভাঙ্গামনে চলতে কি বাজবে সে সুর
আসবে তো মন মাঝে অমানিশা ঘোর।
তার মাঝে গড়ে যদি হিংসার কিছু
অন্যের লাভ দেখে মনে ধরে পিছু।
তাহলে যে শেষ তুমি আর কিছু নাই
মরে যাবে দুই কূলে পাবে না সে ঠাঁই।
দেমাগিতে যদি মন ভাব ধরে যায়
মনে রেখো পাপী মন তুমি অসহায়।
অহংকারে কেউ কভু পায়নি তো জয়
মন পুড়ে ছাই হবে দেহ হবে ক্ষয়।
লোভ-হিংসা-অহংকারে তিনে যাই হয়
অমানুষ দেহটার শুধু পরিচয়।

ই স রা ত জা হা ন ব না নী

ভুলেও ভুলে যেও না

এমন শরীর ঝিম ধরা ঘুম অনেককাল আসেনি।
কেউ চলে যাচ্ছে শুনে বুক ভেঙে
নোনা জলের ঢেউ ওঠেনি দু'চোখে,
ভর দুপুরে বিষন্ন সময়ে
কারো কথা ভেবে বিরহের সুর বাজে নি কোনো বীনায়।
মনের গহীনে গোপন কোনে সেখানে যে তোমার বসবাস
সেই ভিটেমাটির সাথে দেখা হয় না কতকাল!
ওমন করে কেউ শোনায়নি সমুদ্রের গভীর ডাক,
ভেবেছিলাম মনের দরজায় তালা মারা
সেখানে ধর্মঘটের হাঁকডাক।
সব ভাবনাকে বিদায় দিয়ে আজ যেন চঞ্চল তনুমন
ডানা ভাঙা পাখির মতো আহত ক্রন্দন
সব ভেঙে চুড়ে গুড়িয়ে দেয়া প্রেম প্রেম পাগলামির
অনুভূতি আজ শরতের খোলা হাওয়ায় বইছে।
নিশ্বাসের উষ্ণতা, শক্ত হাতের বাধন
খুব মন খারাপের বেলায়
যখন ভরসার ছোঁয়া তোমার কাঁধে,
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে
স্মৃতির খাতায় আঁকিবুঁকি কাটবেই-তাই
ভুলেও ভুলতে যেও না আমায়।

মো শা র র ফ হো সে ন সু জা ত

অষ্টপ্রহরই সমান্তরাল

অষ্টপ্রহরই আমার সমান্তরাল
তবু মাঝে মাঝে হেমন্তের আবহে দেখি শুকতারা
হৃদয়ের ধূসরঙ বর্ণিল শুভ্রতার আলোছায়ায়
মনোহর নদী দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বলতায় ভরে যায়
উচ্ছল উচ্ছ্বাসে নেচে ওঠে প্রকৃতি ও বৃক্ষরাজি
পলকের প্রশান্তিতে ডোবে অন্তর।

যখন ফাগুনের ঢেউ ওঠে কল্পনার আকাশে
স্বপ্নতেই ওড়াউড়ি আগামীর পথে
প্রাতের স্নিগ্ধতায় যত ফুলই ফোটে
বসন্ত বাতাসে যত পাখি গায় গান
জীবনভর সে হিসাব যেন ক্ষণিকের সীমানায়।

মনের জানালার সুরভিত ঝরনাগুলো
লোভের বেসাতিতে শুকিয়ে যায় চৈত্রের খরায়
উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চৌচির হয় হৃদয়ের আল্পনা
প্রত্যাশার পূর্ণতা স্তম্ভিত বৈশাখী ঝরে
শুধু স্মৃতিগুলোর দাপট কাল থেকে কালান্তর।

ক্ষণিক সফরের এই দুর্গমপথে
বারবার খুঁজে ফিরি হৃদয়ের সাগর
পরাভবের বহুমুখী প্রতিভার টানে
বিশ্বাসে মোড়া ছলনার আকাশ দেখে আঁতকে উঠি
তবু প্রশান্তির নিষ্পাপ প্রহর খুঁজি
নিশুতির অগণিত নিদ্রাহীন চোখে।